FEB. 21 2002

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... ...

দৈনিক ইনকিলাব

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

এমাজউদ্দীন আহমদ

ঢাকা যে দিল্লী থেকে স্বতন্ত্র এবং স্বতন্ত্র করাচী ইসলামাবাদ থেকে, তার সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি ঘটেছে ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারীতে। একুশে ফেব্রুয়ারীর জন্ম একদিনে হয়নি। হয়নি এক যুদ্ধে। আর একুশে ফেব্রুয়ারী শুধুমাত্র ভাষা সংরক্ষণেরই সংগ্রাম ছিল না। ভাষার সাথে সংশ্লিষ্ট জীবনবোধ, সাহিত্য-সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য এবং জাতির আধ্যাত্ম সত্তা সংরক্ষণের সংগ্রামেরও মূর্ত রূপ একুশে ফেব্রুয়ারী। তাই এই দিনের তাৎপর্য অত্যন্ত গভীর। একুশের সংগ্রাম একদিকে যেমন এই জাতির আশা-আকাংক্ষার প্রতীক, তেমনি তার স্বপ্নসাধ পূর্ণ করারও নির্দেশক। এর সঠিক তাৎপর্য অনুধাবনের জন্য তাই প্রত্যেককে কয়েক দশক পিছিয়ে যেতে হবে ইতিহাসের সূত্রগুলো আবারও নেড়েচেড়ে দেখার জন্য।

সর্বভারতীয় পর্যায়ে ভাষার প্রশ্নটি সর্বপ্রথম গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে ১৯২৯ সালে প্রকাশিত নেহেরু রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পরে। মতিলাল নেহেরুর সভাপতিত্বে এবং জওহরলাল নেহেরুর সম্পাদনায় যে রিপোর্টটি প্রকাশিত হয়েছিল তাতে ভারতের রাষ্ট্রভাষা রূপে হিন্দিকে সুপারিশ করায় হয়। এর দার্শনিক ভিত্তি রূপে বলা হয়েছিল, ভারতের সভ্যতা-সংস্কৃতি, ইতিহাস-ঐতিহ্য এবং শিল্পকর্ম-সৃজনশীল চিন্তাভাবনার মাধ্যম যেহেতু হিন্দি, তাই ভারতের রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিৎ হিন্দি। কংগ্রেসের সকল মহল এই সুপারিশের সাথে একমত হলেও সমাজের বিভিন্ন মহল থেকে উত্থাপিত হয় এক তুমুল বিতর্ক। সভ্যতা-সংস্কৃতি এবং ইতিহাস-ঐতিহ্যের মাধ্যমে যদি হয় ভাষা তাহলে ভারতের যে বিরাট জনসমষ্টি মুসলমান তাদের স্বাতন্ত্র্য কোথায়? তাদের সভ্যতা, সংস্কৃতি বা ঐতিহ্যের স্থান কোথায়? তাদের জীবনবোধের মাধ্যম তো হিন্দি নয়?

১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এ বিষয়ে প্রচুর বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঘনীভূত হয়েছে তীব্র অসন্তোষ। পুঞ্জিভূত হয়েছে হাজারও বিতর্কিত দীর্ঘশ্বাস। কিন্তু সর্বভারতীয় পর্যায়ে কোন নেতা এগিয়ে আসেননি কোন সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের সুবাতাস নিয়ে। ভারতের মহান নেতা মোহন দাস করম চাঁদ গান্ধী যে সিদ্ধান্ত নিয়ে এগিয়ে এলেন তাও বিতর্কিত হয়ে ওঠে। তিনি বলেছিলেন, ভারতের রাষ্ট্রভাষা হবে হিন্দুস্থানী। দেব নাগরী বর্ণমালায় লিখিত হলে তা হবে হিন্দি আর আরবী বর্ণমালায় লিখিত হলে তা হবে উর্দু। এতেও বিতর্কের অবসান হয়নি। কেননা গান্ধীর নিকট ধর্মকেন্দ্রিক সমাধান ছাড়া তেমন বেশী কিছু ছিল না। বিতর্কের অবসান না হওয়ায় এবং মুসলিম লীগের দাবীর প্রচণ্ডতায় মহাত্মা গান্ধী চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছিলেন এই বলে যে, ভারতের রাষ্ট্রভাষা হবে হিন্দি-হিন্দুস্থানী। এভাবে তিনি ভারতকে এক অখণ্ড রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করার লক্ষ্যে এবং অখণ্ড ভারতে 'রামরাজ্য' প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতির স্বার্থে হিন্দি ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারেননি- যদিও তখন ভারতে হিন্দিভাষীর সংখ্যা শতকরা ২০ কি ২২-এর বেশী ছিল না।

এদিকে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠলে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর জিয়াউদ্দীন বলেছিলেন, ভারতের রাষ্ট্রভাষা হিন্দি হলে অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত কারণে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হতে হবে উর্দু। এভাবে সূত্রপাত হয় ভাষা সম্পর্কিত বিতর্ক। প্রফেসর জিয়াউদ্দীনের বক্তব্যের সূত্র ধরেই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলে ইসলামী রাষ্ট্র পাকিস্তানের কর্ণধার মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ অনেকটা গান্ধীর মতই ঢাকায় এসে বলেছিলেন, উর্দু এবং উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। এই অঞ্চলে বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানে এভাবে সৃষ্টি হয় ভাষা সম্পর্কিত বিতর্ক, যে বিতর্কের অবসান ঘটে ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারী।

সর্বভারতীয় পর্যায়ে যখন হিন্দি ও উর্দুর পক্ষে জোর প্রচারণা চলছিল সমগ্র ত্রিশের দশকব্যাপী এবং ভাষাকে কেন্দ্র করে যখন দু'টি বৃহৎ সম্প্রদায় হিন্দু ও মুসলমান পরস্পরের বিপরীতে অবস্থান গ্রহণ করেছিল সেই সময় বঙ্গদেশ থেকে ভারতের রাষ্ট্রভাষা রূপে বাংলা ভাষার দাবী ক্ষীণকণ্ঠে পেশ করা হয়। তবে এই দাবীতে বাংলার কোন প্রভাবশালী হিন্দু কবি-সাহিত্যিক বা বুদ্ধিজীবীর সুস্পষ্ট উচ্চারণ শোনা যায়নি। শোনা যায়নি কোন মুসলমান কবি-সাহিত্যিক অথবা বুদ্ধিজীবীর উচ্চকণ্ঠও। এ সময়ের সবচেয়ে শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্যন্ত হিন্দির বিরুদ্ধে একটি কথাও বলেননি। শুধুমাত্র অখ্যাত এক প্রফুল্ল কুমার সরকার তার ক্ষীণকণ্ঠে এক সভায় ভারতের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলা ভাষার দাবী উপস্থাপিত করে বলেন, 'একদিকে মানভূম, সিংভূম, সাঁওতাল পরগনা, পূর্ণিয়া, ভাগলপুর অন্যদিকে শ্রীহট্ট, গোয়ালপাড়া, কাছাড় পর্যন্ত বাংলার আসল সীমানা। এই বিস্তৃত ভূখণ্ডে প্রায় ৭ কোটি ৩০ লাখ লোক বাংলা ভাষায় কথা বলে। হিন্দি ভাষীর সংখ্যা এর চেয়ে বেশী নয়...। সাহিত্যের দিক থেকেও বাংলা ভারতের সমস্ত প্রাদেশিক সাহিত্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।' এই পরিস্থিতির ব্যাখ্যা দিয়ে দৈনিক আজাদে যে সম্পাদকীয় (২৩ ফেব্রুয়ারী ১৯৩৭) লেখা হয় তা উল্লেখযোগ্য। লেখা হয়, 'এই রাষ্ট্রনৈতিক হুজুগের স্রোতে একদিকে বাংলার হিন্দুরা আত্মবিস্মৃত অবস্থায় ভাসিয়ে চলিয়াছেন, বাংলার সমস্ত বৈশিষ্ট্যকে পরদেশীদের প্রকাশ করিয়া দিতে / বাংলার মুসলমানও এই হিন্দির প্রচারণার প্রতিক্রিয়ায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া অত্যায় উর্দুকে অবলম্বন করার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন। আমাদের মাতৃভাষার যে বিরাট সর্বনাশ এই সমস্ত রাজনৈতিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার অন্তরালে লুকাইয়া আছে। বাংলার হিন্দু বা মুসলমান কেহই যে সম্বন্ধে চিন্তা করার অবকাশ পাইতেছি না।' মোট কথা, ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্ত হবার পূর্ব পর্যন্ত বাঙালিরা আত্মবিস্মৃত হয়েই থাকে। মাঝে মাঝে পূর্ব বাংলার মুসলিম কবি-সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীরা এ বিষয়ে মুখ খুললেও কোন হিন্দু কবি বা সাহিত্যিক বা বুদ্ধিজীবী হিন্দির বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ করেননি। ১৯৪৩ সালে মাসিক মোহাম্মদী (কার্তিক, ১৩৫০) পত্রিকায় পূর্ববঙ্গের আবুল মনসুর আহমদ 'পূর্ব পাকিস্তানের জবান' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছিলেন : 'উর্দু নিয়ে ধস্তাধস্তি না করিয়া আমরা সোজাসুজি বাংলাকেই যদি পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা ও জাতীয় ভাষা রূপে গ্রহণ করি, তবে পাকিস্তান প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমরা মুসলিম বাঙলার শিক্ষিত সম্প্রদায় নিজেরাই পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রিক, সামাজিক, শিক্ষা খাত, অর্থনৈতিক ও শিল্পগত রূপায়ণে হাত দিতে পারিব।' তিনি আরও লিখেছিলেন, 'জাতির যে অর্থ, শক্তি সময় ও উদ্যম উর্দু প্রবর্তনে অবব্যয় হইবে তাহা যদি আমরা শিক্ষা সাহিত্যে নিয়োজিত করি তবে পূর্ব পাকিস্তানকে আমরা শুধু ভারতে নয়, সমগ্র জগতের শ্রেষ্ঠ দেশে পরিণত করিতে পারিব।' পূর্ব বাংলার কবি ফররুখ আহমদ ১৯৪৬ সালের শেষের দিকে মাসিক সওগাত (আশ্বিন, ১৩৫৪) প্রকাশিত এক প্রবন্ধে, বিশেষ করে পাকিস্তানে উর্দু সমর্থকদের লক্ষ্য করে, 'পাকিস্তান : রাষ্ট্রভাষা ও সাহিত্য' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছিলেন, 'পাকিস্তানের অন্তত পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা যে বাংলা হইবে এ কথা সর্বজনসম্মত হলেও আমাদের এই পূর্ব পাকিস্তানেরই কয়েকজন তথাকথিত শিক্ষিত ব্যক্তি বাংলা ভাষার বিপক্ষে এমন অর্বাচিন মত প্রকাশ করিয়াছেন যাহা নিতান্তই লজ্জাজনক। বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষায় রূপান্তরিত করিলে ইসলামী ঐতিহ্যের সর্বনাশ হইবে- এই তাদের অভিমত। কুৎসিত পরাজয়ী মনোবৃত্তি এর পেছনে কাজ করিয়াছে এ কথা ভাবিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছি।'

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলে মাত্র মাস খানেক পর থেকেই পাকিস্তানে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে উর্দুর অবস্থানকে চ্যালেঞ্জ করে পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষাবিদরা লেখনী ধারণ করেন। ১৫ সেপ্টেম্বরে অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন, আবুল মনসুর আহমদ ও আবুল কাশেমের তিনটি প্রবন্ধের একটি পুস্তিকায় প্রকাশিত হয়। পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু? শীর্ষক এই পত্রিকায় বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য উদাত্ত আহবান জানানো হয়। ১৯৪৭ সালের নভেম্বর মাসে ডঃ এনামুল হক পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার পরিপ্রেক্ষিতে 'উর্দু ও বাংলা' শীর্ষক নিবন্ধে লিখেছেন, "উর্দু বহিয়া আনিবে পূর্ব পাকিস্তানীদের মরণ-রাজনৈতিক, রাষ্ট্রীয়, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক মৃত্যু। এই রাষ্ট্রীয় ভাষার সূত্র ধরিয়া শাসন, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি সর্ব বিষয়ে পূর্ব পাকিস্তান হইবে উত্তর ভারতীয় পশ্চিম পাকিস্তানী উর্দুওয়ালাদের শাসন ও শোষণের ক্ষেত্র।" ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, আবুল কালাম শামসুদ্দীন প্রমুখ পণ্ডিতগণ পাকিস্তানে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার যথার্থতা তুলে ধরে লিখেছেন জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ নিবন্ধ। এইসব চিন্তাবিদ বুদ্ধিজীবীদের লেখায় জাতীয় মানস তৈরি হয় নতুন সৃষ্টির জন্য। প্রস্তুত হয় ভাষা আন্দোলনের উর্বর ক্ষেত্র। বুদ্ধিজীবীদের যুক্তি বিচার মাথায় নিয়ে তারুণ্য উদ্দীপ্ত হয়। প্রস্তুত হয় ঐক্যবদ্ধ, সুসংহত, অজেয় প্রাণ-প্রাচুর্যের ভাণ্ডার নিয়ে সংগ্রামের জন্য। চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি থেকে চিন্তাবিদ বুদ্ধিজীবীদের কলমের সরু খোঁচায় যে স্বপ্নের সূচনা, পঞ্চম দশকের প্রথম ভাগেই সংগ্রামী তরুণদের তাজা রক্তের স্পর্শে তা প্রাণবন্ত হয়ে উঠল। একুশে ফেব্রুয়ারী সেই স্বপ্নেরই জীবন্ত ইতিহাস। একুশের ইতিহাস কিন্তু সাধারণ ছাত্র-জনতার ইতিহাস। এই ইতিহাসের নায়ক ও মহানায়ক তারাই। কোনো নেতা বা দলের নেতৃত্বে এর জন্ম হয়নি। দেশের চিন্তাবিদ বুদ্ধিজীবীরা তাদের সৃজনশীল লেখনীর দ্বারা সমাজ জীবনে এর ক্ষেত্র রচনা করেন। দেশের স্বাধীনচেতা মৃত্যুঞ্জয়ী তরুণরা সেই উর্বর ক্ষেত্রে রক্তবীজ বপন করেন। ফলে এই রক্তাক্ত ফসল। এই তরুণদের সংগ্রামী চেতনা সমগ্র সমাজব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে গড়ে তোলে এক অজেয় শক্তি। তাই পরবর্তীতে রাজনীতিকে দখল করে নতুন দ্যোতনা। সংস্কৃতি ক্ষেত্রে সৃষ্টি হয় এক চিৎশক্তি। সৃষ্টি হয় নতুন ইতিহাস।

একুশে ফেব্রুয়ারীর এই শুভ মুহূর্তে এইসব ব্যক্তিত্ব এবং বহু নাম না-জানা কর্মীদের প্রতি জানাই অভিনন্দন। সকৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি তাদের। একুশে ফেব্রুয়ারীকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস'রূপে ইউনেস্কোর স্বীকৃতিদানের ক্ষেত্রেও রয়েছে বাংলাদেশের কিছু অনাম সাহসী তরুণের সৃজনমূলক পদক্ষেপ। এটিও কোনো নেতা বা দলের অর্জন নয়। এদেশী তরুণদের সফল অর্জনকে গ্রাস করার হীনমন্যতায় আক্রান্ত কিছু রাজনৈতিক নেতা সব কিছুতে ভাগ বসাবার মানসিকতায় দাবি করলেও, এই ঐতিহাসিক পদক্ষেপটিও গৃহীত হয় কানাডা ভিত্তিক দশ সদস্যের বিশ্বের মাতৃভাষা ভক্তদের সেই ছোট্ট গ্রুপ কর্তৃক। এর নাম ৰ্মদপর টিওথলটথণ মিশণত্র মত দণ যমরক্ত. এর সদস্যরা ছিলেন বাংলাদেশ, ক্যান্টন, ইংল্যান্ড, জার্মানী, ভারত, কচি ও ফিলিপিনসের নাগরিক। এক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিয়েছেন বাংলাদেশের সুসন্তান সালাম ও রফিক। তারাই একুশে ফেব্রুয়ারীকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতিদানের জন্য আবেদন করেন জাতিসংঘ এবং জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থা ইউনেস্কোর নিকট। ইউনেস্কোর দ্বিতীয় কমিশন কর্তৃক এই আবেদন সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয় প্যারিসে ইউনেস্কোর ৩০তম অধিবেশনে। এই প্রস্তাব ঐ অধিবেশনে সমর্থিত হয় ২৮টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধি কর্তৃক। সাধারণ পরিষদে তা অনুমোদন লাভ করে সিদ্ধান্ত হিসেবে তা কার্যকর হয় ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বরে। আজকের এই শুভ মুহূর্তে আমরা সবাই কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করি ঐসব নাম না-জানা প্রতিনিধিদের।

আজ একুশে ফেব্রুয়ারী শুধুমাত্র বাংলাদেশের অনাম সাহসী তারুণ্যের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অর্জন নয়। বিশ্ব ইতিহাসের উজ্জ্বল এক অধ্যায়ও। ২০০০ সালের পর থেকে জাতিসংঘের ১৮৯টি সদস্য রাষ্ট্রে এখন শ্রদ্ধাভরে উচ্চারিত হচ্ছে শহীদ বরকত, সালাম, জব্বার ও রফিকের নাম। উচ্চারিত হচ্ছে বাংলাদেশের নাম। ভাষার দাবীতে প্রাণ উৎসর্গকারীদের কথা ও কাহিনী বিশ্বময় প্রচারিত হচ্ছে। প্রচারিত হচ্ছে বিশ্বে আজও যারা ভাষার দাবীতে সংগ্রামরত তাদের প্রেরণার উৎস হিসেবে। তাদের পথ-নির্দেশনার স্মারকরূপে।

লেখক : রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, কলামিস্ট, সাবেক ভিসি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়